দুর্যোগের পূর্বাভাস

মীজান রহমান

“আমি কেন মেয়ে হয়ে জন্মালাম। এই পুরুষের দেশে মেয়ে হয়ে জন্মানো তো অভিশাপ।” বুকভরা আক্ষেপ আর নালিশ মেয়েটির। বয়স তেরো। নাম বলতে সাহস পায় না পাছে কেউ শুনে ফেলে। সবে বুঝতে শিখেছে মেয়ে যে এটা মেয়েদের দেশ নয়। মায়ের কাছে কেঁদে কেঁদে বলতে শিখেছে ঃ কেন আমি মেয়ে হয়ে জন্মালাম। এ-দেশে মেয়েদের আক্ষেপ করতে নেই, নালিশ করার অধিকারই বা কে দিল ওদের। দেশটির নাম সৌদী আরব। যেখানে মহাপ্রভুর মহান বাণী নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ)। যেখানে অবস্থিত মুসলিম জাহানের পবিত্রতম তীর্থভুমি মক্কাশরিফ। পৃথিবীর ১২০ কোটি মানব প্রতিদিন পাঁচবার যে-দেশের কাছে মাথা নত করে নামাজ আদায় করে। আল্লার অপার মহিমা ও করুণাধারা যে-দেশে নিত্য প্রবাহমান - সেই মহান দেশ যার আধুনিক নাম সৌদী আরব। লক্ষ লক্ষ পুণ্যকামী ধার্মিক মুসলমান প্রতিবছর যে-দেশে গিয়ে আল্লাহু আকবর রবে কাবাগৃহ মুখরিত করে তোলে, আরাফাতের ময়দানে গিয়ে অবলোকন করে ইসলামের জন্মলগ্নের সব বিস্ময়কর দৃশ্য, সে-দেশে কি এতটুকু করুণা নেই তেরো বছরের বালিকাদের জন্যে ?

বেচারীর অপরাধ, বাজারে গিয়েছিল তার মায়ের সাথে। বোরখা পরেনি, হিজাব পরেনি। ওর বয়সে ওসব পরার সঠিক কোন নির্দেশও নেই আইনে। কিন্তু সৌদী আরবের ধর্মপুলিশের কাছে আইনের বুলি অর্থহীন। তাদের কাজ হল “পাপমোচন ও পুণ্যপ্রচার।” মেয়েটির পর্দাশূন্য মুখে তারা পাপের ছাপ দেখতে পেল। খুব করে শাসিয়ে দিল তাকে, তার মাকে। বুক ফেটে কান্না এসে যায় মেয়ের - কান্না চেপে রাখে। বুক ফেটে কান্না এসে যায় মায়েরও। তিনি তো অনেক আগেই শিখেছেন কেমন করে কান্না চাপতে হয়। পবিত্র তীর্থভুমিতে মেয়েদের কাঁদাও বারণ। কাঁদা মানে ধর্মের বিধানকে হাসিমুখে গ্রহণ করতে না পারা।

সৌদী আরবের প্রচণ্ড প্রতিপত্তিশীল ধর্মমন্ত্রণালয় পাড়ায় পাড়ায় রাস্তায় রাস্তায় ডাণ্ডাধারী পুলিশ মোতায়েন করেছে পাপমোচনের উদ্দেশ্যে। নিজের মায়ের বয়সী মহিলাকেও প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করার ক্ষমতা আছে সে-পুলিশের যদি তাঁর চামড়ার সামান্যতম অনাবৃত অংশও কোনক্রমে দৃষ্টিগোচর হয় তার। নারীর নারীত্ব যেন কোনভাবেই বাইরে প্রকাশ না পায়। তেরো বছরের কিশোরী যেন আনন্দময়ী কিশোরী হবার স্বপ্ন না দেখে। মেয়েরা নারী হবে শুধু স্বামীর কাছে। বাইরের জগতে সে নারী নয়, সে একটি চলৎশক্তিসম্পন্ন শবাধার। একটি কাফন - শ্মশানঘাটের মুর্তিমান প্রেতাত্মা। তাকে দেখে যেন কোন পুরুষ লালায়িত না হয়। লালায়িত হলে সেটা পুরুষের দোষ নয় তারই দোষ। লালায়িত হওয়াটা পুরুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। তাকে লালায়িত হবার সুযোগ না দেওয়া নারীর স্বাভাবিক কর্তব্য। এটাই নাকি শরিয়া। সৌদী আরবের শরিয়া। মুসলিম জাহানের আপামর শরিয়াপ্রেমিকদের স্বপ্ন। গোটা

পৃথিবীময় তারা শরিয়ার শাসন প্রবর্তন করবে। গোটা পৃথিবীর মেয়েরা কাফন পরে হাঁটবে। এটাই তাদের লক্ষ্য।

সৌদী আরবের সেই পাশবিক ঘটনাটা মানুষ হয়ত ভুলে গেছে। তীর্থস্থানের অপ্রিয় ঘটনা মনে রাখাও হয়ত পাপ। এতগুলো মেয়ে যে আগুনে পুড়ে মরল সেই ঘটনার কথা বলছি। আগুন লেগেছিল মেয়েদের হলে। দরজা খোলা থাকলে তারা অনায়াসে পালিয়ে জীবন বাঁচাতে পারত। কিন্তু পর্দানীতির লংঘন হবে বলে ধর্মপুলিশ দরজা খুলতে দেয়নি। অসহায়ভাবে আটকেপড়া মেয়েগুলোর মর্মভেদী চিৎকার শুনেও পাষাণগুলোর প্রাণ গলেনি - বোরখা না পরলে কাউকে বের হতে দেওয়া হবে না, সোজা কথা। ভারতবর্ষের সতীদাহ প্রথার কথা মনে পড়তে পারে। সেখানেও দেখুন মুলের জিনিস একই - ধর্ম। এবং দু'টোতে একই নায়ক - পুরুষ। একই শিকার - নারী। তফাৎ এই যে সতীদাহের পর মেয়েটিকে অন্তত সতী বলে ঘোষণা করা হত, প্রায় দেবীর আসনে বসানো হত। কিন্তু সৌদী আরবের মেয়েগুলোর ভাগ্যে সে-সম্মানটুকু জুটেছিল কিনা সন্দেহ। ক'টা হতভাগী মেয়ে পুড়ে মরেছে, তাতে হয়েছেটা কি!

রিয়াদ থেকে মৌনা নইম বলে এক ভদ্রমহিলা ওখানকার মেয়েদের অবস্থা জানিয়ে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন প্যারিসের 'লামণ্ড' পত্রিকায়। সেটা ইংরেজীতে ছাপা হয়েছে বিলেতের সাপ্তাহিক 'গার্ডিয়ান'-এ। তা থেকেই জানা গেল সৌদী আরবের সাম্প্রতিক চালচিত্র। উত্তর ৯/১১-এর বাতাস বেশ জোরেসোরেই লেগেছে সেখানে বলে মনে হয়। সৌদী সদন এখন কম্পমান। প্রজার জন্য শরিয়া আর রাজার জন্য সুরা - এই শাহী নীতি আর বোধহয় ধরে রাখা গেল না। লাদেন সাহেবের চারটে উড়ন্ত বোমা সমস্ত পশ্চিমকে যেমন কাঁপিয়ে তুলেছে তেমনি কাঁপিয়ে তুলেছে পশ্চিমের যাবতীয় শয্যাসঙ্গিনীদেরও। সবারই এখন 'চাচা আপনা জান বাঁচাও' অবস্থা। সৌদী আরবে এতদিন 'সংস্কার' শব্দটা উচচারণ করতে সাহস পায়নি কেউ। কিন্তু এখন হাটবাজার আর মক্তবমাদ্রাসা সবজায়গাতেই সংস্কারের ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে। এবং সেই ধোঁয়াতে কিছু মেয়েলি কণ্ঠও উচচারিত হয়ে উঠতে চাইছে। সৌদী সমাজের জন্যে এটা অত্যন্ত খারাপ লক্ষণ। পুরুষের সংস্কারকামনা সহ্য করা যায়, কিন্তু মেয়েরা সংস্কার চাইবে সে কি করে সম্ভব। পুরুষের আন্দোলনের চেয়ে মেয়েদের আন্দোলন হাজারগুণ বিপজ্জনক। তাই দেশব্যাপী সংস্কারের আবহাওয়া বিরাজ করলেও মেয়েদের সংঘবদ্ধ হয়ে তাতে যোগ দেওয়াতে বিপদ আছে। অনায়াসে তারা 'সেকুলারিজম'এর ফাঁদে পড়ে যেতে পারে। ইসলামিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু হল ধর্মনিরপেক্ষতা। মুসলিম বিশ্বের একটি বদ্ধমুল ধারণা যে পশ্চিমের ধর্মনিরপেক্ষ নীতিমালাই তার নৈতিক অধঃপতনের মুল কারণ।

মৌনা নইমের নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়ঃ রিয়াদের বিশ্ববিদ্যালয়গামী মেয়েরা। আপাতদৃষ্টিতে তাদের অবাধ সুযোগ লেখাপড়া শিখে নিজেদের ইচছা আকাংক্ষা পুর্ণ করবার এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মকে শিক্ষাদীক্ষায় সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার গুরু-দায়িত্বে সক্রিয় অংশ নেবার। কিন্তু সেটা কেবলি আপাতদৃষ্টিতে। আসল চিত্রটা একটু অন্যরকম। কাগজে কলমে সুযোগ আছে ঠিকই কিন্তু নিয়ন্ত্রণটা তাদের হাতে নয়। নিয়ন্ত্রণ হল শরিয়ার হাতে, এবং শরিয়ার শাসনকে বলবৎ করার

চাবিকাঠি যাদের কাছে, তাদের হাতে। ষাটের দশকের শেষদিকে বাদশা সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল ক্লাসের ভেতরে তারা হিজাব-বোরখা পরবে কি পরবে না। তখন তাদের অধ্যাপকদের সকলেই ছিলেন পুরুষ। ওসময়কার ছাত্রীদের অনেকেই এখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় নিযুক্ত। কালে কালে ওখানে একটি স্বতন্ত্র নারী অনুষদ গড়ে ওঠে যেখানে মেয়েদের পুর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় নিজেদের ইচেছমত সবকিছু করার। তাদের এলাকায় অধ্যাপক ছাড়া অন্য কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। মোটামুটি ভালই চলছিল। কিন্তু আশির দশকের শেষ থেকে শাসকদের মনোভাব শক্ত হতে শুরু করল, বিশেষ করে '৯১র উপসাগরীয় যুদ্ধটার সময়। গুটিকয়েক দুঃসাহসী মেয়ে দাবি করে বসল তারা গাড়ি চালানোর স্বাধীনতা চায়। ব্যস, আর যায় কোথায়। এত বড় আস্স্লর্ধা ! অন্তঃপুরের স্বাধীনতা হজম করা যায়, কিন্তু প্রকাশ্য আস্স্লর্ধা সহ্য করে কি করে। কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলেন যে লেখাপড়াজানা মেয়েদের ওপর পশ্চিমের প্রভাব পড়েছে। খারাপ লক্ষণ। অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে একে। ফলে শুরু হয়ে গেল এক আবপসবিহীন শোধনপ্রক্রিয়া। মহিলা অধ্যাপক যারা গাড়ি চালানোর দাবিতে অংশ নিয়েছিলেন তারা চাকরি হারালেন। পরুষ অধ্যাপকদের জন্যে মেয়েদের এলাকা নিষিদ্ধ করা হল। মেয়েদের পাঠ্যসুচীতে অন্যান্য বিষয়ের চাইতে ইসলামী শিক্ষাকে দেওয়া হল অগ্রাধিকার। ক্যাম্স্লাসের দু'টি শাখা পরস্স্লর থেকে পুরোপুরি বিচিছন্ন হয়ে গেল। একটি ছেলেদের, একটি মেয়েদের। আবাসিক মেয়েদের ওপর আরোপ হল নানারূপ নিষেধাজ্ঞা। দেয়ালের বাইরে পা বাড়াবে না। জোরে কথা বলবে না। কম্স্লিউটার রুমে গিয়ে কম্স্লিউটার শিখতে চাও শেখো, কিন্তু ল্যাপটপ ব্যবহার করবে না। মোবাইল ফোন তোমার দরকার নেই। অন্য মেয়েদের সঙ্গে বেশি আড্ডা দেবে না। সংযতভাবে পোশাকপরিচছদ পরবে। লম্বা কোর্তা পরবে যাতে পায়ের নখ পর্যন্ত ঢেকে থাকে। লম্বাহাতার ব্লাউজ পরবে, চকমকে রংয়ের কাপড় পরবে না - কালো, বাদামী আর ছাই-এর মধ্যে বাছাই করবে। বাবা আর ভাই ছাড়া আর কারো সঙ্গে বাইরে যাবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি। যারা আবাসিক নয় তাদের ওপরও ফরমান আছে। ক্লাস শুরু হওয়ার বেশি আগে ক্যাম্স্লাসে আসবে না। বাড়ি ফেরার সময় অভিভাবকের জন্যে অপেক্ষা করবে ক্যাম্স্লাসের ওয়েটিংরুমে, অন্য কোথাও নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন সফরের আয়োজন করলে মেয়েদের পোশাকের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হয় - আপাদমস্তক না ঢেকে ঘরের বাইরে পা দেবার উপায় নেই। বাস বা কোচের জানালাগুলো পরিষ্কার কাচ হলে চলবে না, রঙিন হতে হবে যাতে বাইরে থেকে কেউ তাদের দেখতে না পায়। দু'টি মেয়ে একবার ধর্মপুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল বিদেশী পত্রিকার পাতা উল্টানোর অপরাধে। সেজন্যে শুধু তারাই ভোগেনি, তাদের পরিবারদেরও জবাবদিহি করতে হয়েছিল। একজন ছাত্রীর মতে সৌদী আরবে অংকের সোজা সমীকরণ ঃ *নারী = পাপ।*

নাম প্রকাশে অনিচছুক এক সৌদী মহিলা শিক্ষাবিদ বলছেন ঃ "শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের ওপর যে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে তার ফলে ওরা শিক্ষা যত-না পাচেছ তার চেয়ে বেশি হচেছ আতঙ্কসঞ্চার। সমাজপতিরা দাবি করছেন এসব নারীর নিজেরই স্বার্থে - তাদের প্রতিরক্ষাই নাকি এর মুল উদ্দেশ্য। কিন্তু

এতে কি পরুষের সুশিক্ষার অভাবটাই প্রমাণ হয় না ? পুরুষ শেখে তার দাবি, তার অধিকার। আর মেয়েকে শিখতে হয় তার দায়িত্ব, তার কর্তব্য। *পুরুষের সাত খুন মাপ। নারীর আরেক নাম পাপ।* কিছু উদারমনা পুরুষ আছেন যাঁরা মনে করেন মেয়েদের জন্যে আলাদা শপিং সেন্টার খুলে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যেন শপিং ছাড়া মেয়েদের জীবনে আর কিছু নেই। অথচ এই পুরুষগুলোই কোন অসঙ্গতি খুঁজে পান না যে মেয়েদের অন্তর্বাসের দোকানে কোন মেয়ে কর্মচারী নেই। আসলে এদেশের মুল সমস্যা হলঃ পুরুষজাতিটা কখনো মেয়েদের সম্মান করতে শেখেনি।"

অধ্যাপক সোলায়মান আল্-হাট্লান সৌদীর দৈনিক পত্রিকা 'আল-ওয়াতান'এ নিয়মিত কলাম লেখেন। তিনি বলছেন ঃ "নারীর প্রতি সমাজের এই চিরাচরিত অসম্মান, অনাস্থা ও অন্যায় আচরণ শুধু যে নারীর মনুষ্যত্ব ও জাতীয়তাকে হরণ করে ক্ষান্ত হয়েছে তা নয়, সাথে সাথে গোটা জাতিটাকেই করেছে খর্ব, পঙ্গু ও বন্ধ্যা। এর চেয়ে বড় লজ্জা আর কি হতে পারে যে আমাদের এত জনসম্পদ, এত প্রাকৃতিক সম্পদ, এত বুদ্ধিমত্তা থাকা সত্ত্বেও আজকের সৌদী সমাজ একটি বর্ণহীন গন্ধহীন সৌন্দর্যহীন ক্লীব সমাজে পরিণত হয়েছে। নারীর প্রতি আমাদের মৌলিক সম্মানবোধকে কেমন করে আমরা সঁপে দিলাম গুটিকয় কট্টর ইসলামীর হাতে?"

আশ্চর্যের বিষয় যে পবিত্র তীর্থভুমির এই কঠোর ছবিটাও অনেক পুণ্যবান মুসলমানের কাছে যথেষ্ট পবিত্র বলে মনে হয় না। তাঁরা আরো কঠোরতা কামনা করেন। তাই তালেবানশাসিত আফগানিস্তান তাঁদের কাছে এত আকর্ষণীয় মনে হয়। তাঁদের বিশ্বাস, বর্তমান বিশ্বে প্রকৃত ইসলামের স্বর্ণযুগ ছিল তালেবানদের স্বল্পমেয়াদী শাসনকালেই। পাঠক নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে তখন মেয়েদের বিদেশী ম্যাগাজিন পড়া দুরের কথা স্কুলে যাওয়াই ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ধর্মপুস্তক ছাড়া অন্য কোন পুস্তক পড়ার প্রয়োজন নেই তাদের, ফরমান দিয়েছিলেন মোল্লা ওমর ও তাঁর চেলাচামুণ্ডারা। তাঁদের শরিয়া পরুষকেও ছাড় দেয়নি। সাবালক পরুষদের বলা হল দাড়ি রাখতে হবে, এবং সে-দাড়ির দৈর্ঘ হতে হবে শরিয়াসম্মত। মেয়েদের পর্দা আর পরুষের দাড়ির খবরদারি করার জন্যে দাঁড়িয়ে গেল এক বিশাল বাহিনী, সৌদী আরবের ধর্মপুলিশের মত। দেশবাসীকে ধর্মের পথে ফেরানোর উদ্দেশ্যে বন্ধ করে দেওয়া হল সব সিনেমাহল। টেলিভিশন বন্ধ। ফটো তোলা বন্ধ। ছবি আঁকা বন্ধ। ভাস্কর্য বন্ধ। গানবাজনা বন্ধ। শিল্পকলা বন্ধ। কাব্যচর্চা বন্ধ। কারো বাড়ির দেয়ালে ছবি থাকবে না। মাদুরে ছবি থাকবে না। বাদ্যযন্ত্র থাকবে না। পশ্চিমের তাড়া খেয়ে তালেবানরা এখন ছুট দিয়েছে ঠিকই কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি আর কঠোরতা যেন আফগান চরিত্রেরই একটা বৈশিষ্ট্য। পত্রিকায় পড়লাম, সালমা নামের এক জনপ্রিয় গায়িকার ডিভিডি দেখানো হয়েছে আফগান টিভিতে। গত দশবছরের মাঝে এমন দুঃসাহসী কাজ কেউ করেনি সেখানে। এতে নতুন যুগের ছেলেমেয়েদের অনেকেই খুশি, কিন্তু পুরনোদের মুখ কালো হয়ে গেছে। এক প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেছেন, "কাজটা ভাল করেনি তারা। এটা ইসলামবিরোধী। সংবিধান অনুযায়ী তাদের অধিকার নেই এ-দৃশ্য প্রচার করা।"

এই নিবন্ধের মুল আলোচ্য বিষয় অবশ্য সৌদী আরব বা আফগানিস্তান নয়। আলোচ্য বিষয় আমার

জন্মভুমি বাংলাদেশ। সেখানে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে সুক্ষ্ম প্রয়াসগুলো সম্প্রতি সুক্ষ্মতার মুখোশ ছেড়ে জনগণের স্থুল চেতনাতে উপস্থিত হবার উদ্যোগ নিয়েছে তা নিয়ে ব্যাপক আলাপ আলোচনার সময় এসে গেছে বলে আমার বিশ্বাস। জামাতী-ইসলাম নামটি কারো অজানা নয়। এটা একটি বহুরূপী সংস্থা - একেক সময় একেক জায়গায় একেক রূপে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু তার মুল চরিত্র অপরিবর্তিত রয়ে গেছে জন্মকাল থেকে অদ্যাবধি। জামাতী ইসলাম একটি কট্টর ধর্মকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল। এর জন্ম লাহোরের এক বিত্তশীল গোঁড়া মুসলমানের বাসগৃহে, ১৯৪১ সালের ২৬শে আগস্ট। মৌলানা মওদুদী ছিলেন সেই দলের নেতা-প্রতিষ্ঠাতা ও মন্ত্র-গুরু। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামিক রাষ্ট্র স্থাপন করা, গোটা ভারতবর্ষে। জামাতের ইসলাম কিন্তু আমাদের বাপদাদা চোদ্দপুরুষের ইসলাম নয়। তাদের ইসলাম হল সৌদী আরব ধরণের ইসলাম। বরং তার চেয়েও কঠোর - তালেবানি ইসলামের সঙ্গে জামাতী ইসলামের অনেক মিল আছে। তাঁদের হিসেব অনুযায়ী সুন্নীরা ছাড়া আর কেউ মুসলমান নয়। এবং কোরাণের আক্ষরিক বিধান যারা পালন করে না তাদের জন্যে আল্লাতা'লা দোযখের রাস্তা খোলা রেখেছেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সমস্ত পৃথিবীই একদিন ইসলাম অবলম্বন করবে, তবে সেটা বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব সব মুসলমানেরই অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। এই কর্তব্য, এই সংগ্রামই হল সত্যিকারের জিহাদ। তার জন্যে যদি রক্তপাতের প্রয়োজন হয় হোক। নৃশংসতার প্রয়োজন যদি হয় হোক। আল্লার কালাম প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে শত্রু নিপাত তো করতেই হবে। ওটা তো জিহাদেরই অংশ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে একাত্তরের ঘটনাবলীর একটা যুক্তি পাওয়া যায় বৈকি। মৌলভীসাহেবরা যে তখন হানাদারদের সাথে মিতালি করে বাঙালিদের বধ্যভুমিতে পাঠিয়েছিলেন তার মুল কারণটা এখানে - দেশটাকে কলুষমুক্ত করে আল্লার শাসনের উপযোগী করে তোলা। একাত্তরে অবশ্য বাঙালিদের চিন্তাধারা ছিল একটু অন্যরকম। ধর্ম বিসর্জন না দিয়েও যে দেশপ্রেমিক বাঙালি হওয়া যায় এবং বাঙালিত্বের মধ্যে যে গৌরব আছে, আছে বিশাল ঐতিহ্য ও আত্মমর্যাদা সেরকম একটা বিশ্বাস এসে গিয়েছিল পুর্ববঙ্গের জনগণের মধ্যে। সেই চেতনা ও তেজোবীর্যের সাথে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সহযোগিতা - দু'য়ে মিলে এক অসাধ্য সাধন হয়ে গেল মাত্র ন'মাসের মধ্যে - স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশে। তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয়, বাংলাদেশের মত একটি পশ্চাদপদ গোঁড়া মুসলিমপ্রধান দেশ অনায়াসে বরণ করে নিল ধর্মনিরপেক্ষতা বা ইহজাগতিকতার মত একটি আধুনিক মানববাদী মতাদর্শ। জামাতীর সিপাইসেনারা সাময়িকভাবে লেজ গুটিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু পরাস্ত হলেও নিরস্ত্র হবার পাত্র নন তাঁরা। সাময়িক পরাজয় মেনে নিলেও তাঁরা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। প্রকাশ্যে গাঢাকা দিলেও আড়ালে তাঁদের কার্যক্রমে তেমন একটা ছেদ পড়েনি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যেদিন জামাতীদের বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন, বলতে গেলে সেদিন থেকেই শুরু হল বাংলাদেশের পতন। আজকে দেশে যা কিছু অঘটন ঘটছে তার অনেকটাই সেই অশুভ ঘটনাটির ফলশ্রুতি। অন্তত আমার মতে।

জামাতের মৌলভীসাহেবদের একটা জিনিসের প্রশংসা করতেই হয় - তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তা। লক্ষ্য

থেকে কখনো বিচ্যুত হন না তাঁরা। ব্যক্তিগত ধনদৌলতের প্রতি তাঁদের খুব আকর্ষণ নেই। অন্যদের মত ছ্যাঁচড়া চুরিচামারিতে তাঁদের আগ্রহ নেই। ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই তাঁরা খুশি। তার জন্যে তাঁরা খুন করতে প্রস্তুত। আগুন লাগিয়ে মানুষ পোড়াতে প্রস্তুত। ইসলামী জমানার জন্যে তাঁরা রক্ত দিতেও রাজী। জনগণ সেটা চাক বা না চাক তাতে কিছু আসে যায় না। তাঁদের বিচারে মানুষের জন্যে ধর্ম নয়, ধর্মের জন্যে মানুষ। মানুষ যায় যাক, ধর্মের পবিত্রতা যেন অক্ষত থাকে। হিটলার যেমন জার্মানী তথা সারা ইউরোপকে ইহুদীমুক্ত করে একটি বিশুদ্ধ শ্বেতাঙ্গজাতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন জামাতের হুজুরেরাও তেমনি দেশকে বিধর্মীমুক্ত করে একটি পবিত্র ইসলামী সমাজ সৃষ্টিতে সচেষ্ট। তাঁদের সংজ্ঞা অনুযায়ী যারা ইসলাম পালন করে না তারা সবাই বিধর্মী। এবং বিধর্মীমাত্রই তাঁদের শত্রু জাতশত্রু। তাঁরা সবসময় শত্রু খুঁজে বেড়ান। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান তো অবশ্যই তাঁদের শত্রু। সেজন্যেই হিন্দুর পরিবার জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হয়, বৌদ্ধের ভিক্ষু আততায়ীর হাতে প্রাণ হারায়, খ্রীষ্টানের গীর্জায় বোমা বিস্ফোরিত হয়। যে-হারে এগুচেছন তাঁরা তাতে মনে হয় এ-সম্প্রদায়গুলোর অস্তিত্বই থাকবে না একদিন। ভাগ্য ভাল যে বাংলাদেশে ইহুদী নেই। তাহলে যে কি অবস্থা দাঁড়াত ভাবতেই গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়। জামাতী এবং তাঁদের দোসরদের ভয়ানক শত্রু-পিপাসা। এত পিপাসা যে শত্রু না থাকলেও তাঁরা শত্রু তৈরি করে নেবেন। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা সম্ভবত তাঁদের একটা বড়রকমের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শামসুর রাহমানের জীবনের ওপর হামলা, শাহরিয়ার কবির ও মুনতাসির মামুনের মত ধীশক্তিসম্পন্ন খ্যাতিমান পুরুষদের শ্রীঘরপ্রেরণ - এসব তার পুর্বলক্ষণ বলেই মনে হয় আমার কাছে। সময় সঠিক বিবেচিত হলে কি ধরণের অভিযান শুরু হবে এঁদের ওপর সেটা কল্পনা করে আমি আহারনিদ্রা ভুলে যাই। রায়ের বাজারের সেই ভয়াবহ দৃশ্য আমার দেশবাসীরা হয়ত ভুলে গেছে, কিন্তু আমরা পুরনো প্রবাসীরা এখনো ভুলিনি। সেই রায়ের বাজার যে আবারো ঘটবে দেশে এবং তার চেয়ে হাজারগুণে ব্যাপক ও হিংস্র আকারে তার পুর্বাভাস আমি দেখতে পাচিছ সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে।

ইদানিং বাংলাদেশের মৌলভীসাহেবরা এক নতুন শত্রু আবিষ্কার করেছেনঃ কাদিয়ানী। আমাদের মুসলমানদের মধ্যে যে-ক'টি সম্প্রদায়কে আমরা আদৌ মুসলমান বলে গণ্য করি না তাদের মধ্যে কাদিয়ানীরা অন্যতম। যদিও লেখাপড়া ও চিন্তাভাবনার দিক থেকে বিচার করলে মুলধারার মুসলমানদের চেয়ে তারা বোধহয় অনেকটাই অগ্রসর। পাকিস্তানেও তাই। বরং আরো বেশি। পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রি জাফরুল্লাহ খান যার বাগ্মিতায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের সদস্যরা, তিনি ছিলেন কাদিয়ানী। পাকিস্তানের সবচেয়ে কৃতী সন্তান, স্বদেশের জন্যে যিনি অর্জন করেছিলেন সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক মানমর্যাদা, নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক আব্দুস সালাম, তিনিও ছিলেন কাদিয়ানী। শেষ জীবনে তাঁর একটাই আক্ষেপ ছিল ঃ মক্কায় গিয়ে হজ্জ আদায় করতে পারেননি। কয়েকবার তিনি চেষ্টা করেছিলেন যেতে, কিন্তু প্রতিবারই সৌদী সরকার তাঁকে অনুমতি দিতে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ তাদের বিচারে তিনি মুসলমান ছিলেন না।

আমার ছোটবেলার ধর্মশিক্ষা থেকে এমন ধারণা জন্মেছিল যে কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়

সে-বিচার একমাত্র আল্লাতা'লা ছাড়া আর কারো করবার ক্ষমতা নেই, কারণ তিনিই শুধু মানুষের ভেতর দেখার শক্তি ধারণ করেন, আর কেউ করেন না। আমার এখনো মনে আছে ঢাকা মুসলিম হাই স্কুলের অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ হেডমাস্টার আব্দুর রহমান সাহেবের কথা। পঞ্চাশ দশকে তিনি একবার যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন কি এক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে। এখান থেকে দেশে ফিরে আমাকে বলেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। অনেক ঘটনা বলার পর তিনি এমন একটা মন্তব্য করলেন যে শুনে আমি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বললেন যে আমেরিকাতে গিয়েই তিনি সত্যিকারের মুসলমানের সাক্ষাৎ পেলেন। কথাটা শোনার পর লোকটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। ছোটবেলায় আমি এ'ও শিখেছিলাম যে ইসলাম একটি সহনশীল ধর্ম, যা অন্যের বিশ্বাসকে সম্মান করতে জানে। তার উদাহরণ আমি নিজের পরিবারেই দেখেছি। আমার বাবা ছিলেন তাহাজ্জুদপরা পরহেজগার মানুষ। অথচ তিনি আমাকে নিয়মিত তাঁর হিন্দু বন্ধুদের বাড়িতে নিয়ে যেতেন, জন্মাষ্টমীর মিছিলে নিয়ে যেতেন প্রতিবছর, মোহাররমের সময় শিয়াদের মিছিলে নিতেও ভুলতেন না, কৌতূহলবশত খ্রীষ্টানদের গীর্জাতে যেতেও নিরুৎসাহ করতেন না। সেকালে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরকম।

সেই ছোটবেলার ইসলামের সাথে জামাতীর ইসলাম যেন কিছুতেই খাপ খায় না। ১৯৪১ সালের গড়ে ওঠা সেই দলটির সঙ্গে ইসলামের যত মিল তার চেয়ে বেশি মিল পাই মধ্যপশ্চিম আমেরিকার অধুনালুপ্ত বর্ণবাদী সংস্থা কু ক্লা□ক্ল্যানের সঙ্গে। ক্ল্যানের শত্রু ছিল কৃষ্ণাঙ্গজাতি আর জামাতীর শত্রু হল তাদের মতে যারা অমুসলমান। দুয়েরই পদ্ধতি এক ঃ সহিংসতা, ধ্বংস, নিপাত। ক্ল্যান যেমন ছিল গোঁড়া খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী, জামাত তেমনি উগ্র সুন্নীমতবাদী। ইসলাম পালনের চেয়ে ইসলামের মাস্তানগিরির প্রতিই ছিল তারা বেশি আকৃষ্ট। তাই পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই তাদের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল কাদিয়ানীদের প্রতি। বাকপটু মৌদুদী ও তার চেলাচামুণ্ডাদের বিষোদ্গারে তপ্ত হয়ে ক্ষিপ্ত জনতা আক্রমণ চালালো নিরীহ কাদিয়ানীদের ওপর। পথেঘাটে অহরহ হয়রানি থেকে অগ্নি সংযোগ, এমনকি খুনখারাবি কোনটাই তারা বাদ রাখেনি। যে-সময় পুর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন তুঙ্গে উপস্থিত প্রায় একই সময় 'কাদিয়ানী-তাড়াও' আন্দোলন সাপের মত ফণা তুলে উঠছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। আমরা চাইছিলাম ভাষার অধিকার, ওরা চাইছিল এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিগ্রহের অধিকার। তাদের দাবি ঃ কাদিয়ানীদের আইন করে 'অমুসলমান' ঘোষণা করতে হবে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে তারা চাইছিল পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র ঘোষণা করা হোক। ইসলামিক রাষ্ট্র হলে তো অমুসলমানরা এমনিতেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়ে পড়ে। তাদের আন্দোলন এমনই জোরদার হয়ে দাঁড়ালো যে সরকার উপায়ান্তর না দেখে একটি শক্তিশালী আইন কমিশন গঠন করলেন, যার দায়িত্ব দেওয়া হল জাস্টিস মুনির ও জাস্টিস কায়ানী নামক দু'জন বিচারপতির হাতে। তাঁদের ওপর ভার দেওয়া হল ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাবার। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে মুনির কমিশনের দীর্ঘ রিপোর্ট বের হল। এখনো কিছু মনে আছে আমার ঘটনাটা। পাকিস্তানের ইতিহাসে এমন সুচিন্তিত সুলিখিত ও সুপাঠ্য রিপোর্ট আর কখনো বেরিয়েছে কিনা সন্দেহ। পত্রপত্রিকায়

রিপোর্টের সারাংশ পড়েই তুমুল সাড়া উঠেছিল দেশে, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী মহলে। কাটা কাটা যুক্তি, তীক্ষ্ম বিদ্রূপ, রসালো রচনা - সে এক স্মরণীয় রাজভোগ যেন। রিপোর্টের মুল বক্তব্যটা ছিল এরকম। কোন একটি সম্প্রদায়কে 'অমুসলমান' বলে ঘোষণা করার আগে একটা বিষয়ে আইনজ্ঞদের ঐকমত্য থাকা প্রয়োজন ঃ 'মুসলমান' শব্দটার আইনসম্মত সংজ্ঞা কি। সে-প্রশ্নের জবাব তাঁরা কামনা করলেন পাকিস্তানের কতিপয় শীর্ষস্থানীয় আলেমদের কাছে। এই আলেমগণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ-পরামর্শ দ্বারা উপকৃত হবার আশাতে বিচক্ষণ বিচারপতিগণ তাঁদের আলাদা আলাদা ঘরে বসার ব্যবস্থা করে দিলেন যাতে একে অন্যের দ্বারা কোনভাবে প্রভাবিত না হতে পারেন। ফলটা যা দাঁড়ালো সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। আলেমগণ নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে 'মুসলমান' শব্দের যে-সংজ্ঞা পেশ করলেন, দেখা গেল, তার একটির সঙ্গে আরেকটির কোন মিল নেই। মিলের বদলে ছিল বরং পরস্পরবিরোধীতা। তাতে বিচারপতিগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে, যেহেতু এক আলেমের সংজ্ঞা অনুযায়ী আরেক আলেমের মুসলমান প্রকৃত মুসলমান নয় এবং যেহেতু মুসলমান পরিবারে জন্মানো অমুসলমান প্রকৃতপক্ষে মুরতাদ বিবেচিত সেহেতু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয়, সুতরাং ইসলামিক রাষ্ট্রে অধিকাংশ মুসলমানই কোন-না-কোন সংজ্ঞা অনুযায়ী আইনত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হবার সম্ভাবনা নিয়ে জীবনধারণ করবে। অতএব ইসলামিক রাষ্ট্র জনগণের জন্যে কল্যাণকর হবে বলে আশা করা যায় না। বলা বাহুল্য যে জামাতীদের হিংসার মাস্তুলে যে বাতাসটা তীব্রবেগে বইতে শুরু করেছিল সেটা খানিক চুপসে গেল বিচারপতিদের যুক্তির ধারে। হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডের অপরাধে পরে মওলানা মৌদুদীর ফাঁসির হুকুম হয়েছিল যদিও তা কার্যকরী হয়নি কখনো।

গল্পটা মনে পড়ে গেল কারণ আজকে বাংলাদেশে যে উন্মাদনা শুরু হয়ে গেছে তার সঙ্গে পঞ্চাশের পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকটা মিল আছে। অনেকটা, তবে সবটা নয়। কারণ পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের তখনো পুর্ণ মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেনি যার প্রমাণ তাঁরা দিয়েছিলেন মুনির কমিশন গঠন করে। অন্তত কাদিয়ানী সমস্যার ব্যাপারে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে দুরদর্শিতার পরিচয় ছিল। তাঁরা পাগলের নাচের সঙ্গে নিজেরাও নাচতে শুরু করেননি। দুঃখের বিষয় যে বাংলাদেশের বর্তমান শাসকদের ক্ষেত্রে অনুরূপ ইতিবাচক মন্তব্য করা সম্ভব হচেছ না। তাঁরা পাগলের নাচে যোগই দিচেছন না কেবল, নতুন পাগল ডেকে আনছেন এদিক সেদিক থেকে। কাদিয়ানীদের বইপুস্তক বাজেয়াপ্ত করলে কাদিয়ানী বিদ্বেষ কি কমবে না বাড়বে ? বাংলাদেশের ক'জন মানুষ কাদিয়ানী বই পড়ে বা বোঝে যে তাদের কাতর অনুভুতিকে রক্ষা করার জন্যে আইন করে ওদের ছাপাখানা বন্ধ করে দিতে হবে ? জনগণের দৈনন্দিন জীবনের নিরাপত্তা রক্ষাতে যে-সরকার নিদারুণ ব্যর্থতার পরিচয় দিচেছন সে-সরকার মুষ্টিমেয় সুন্নী মুসলমানের অনুভুতি রক্ষার জন্যে এত তৎপর হয়ে উঠেছেন কেন ? কাদিয়ানীরা মুসলমান কি অমুসলমান সেটাই কি আজকের বাংলাদেশের গুরুতর সমস্যা ? এর চেয়ে জরুরী সমস্যা কি তাঁদের চোখে পড়ছে না ? এতে দুষ্ট লোকের মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে আজকে বাংলাদেশের আসল সঙ্কট হল উপরতলায় - মগজে, বুদ্ধিতে। পাকিস্তান আমাদের যত ক্ষতিই করে

থাকুক অন্তত একটা কৃতিত্ব দিতেই হবে তাদের - মওলানা মৌদুদীর ফাঁসির হুকুম। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের মৌদুদীদের কোনদিনই বিচার হবে না, কারণ তারাই এখন বিচারকের আসনে।

সাম্প্রতিককালে দেশে কতগুলো ঘটনা ঘটেছে যা আপাতদৃষ্টিতে বিচিছন্ন মনে হলেও তাদের মধ্যে একটা মিহিসুতোর বন্ধন আছে বলেই আমার বিশ্বাস। চাটগাঁয়ের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর বর্বর আক্রমণ, ঘনঘন নারীহরণ ও গণধর্ষণ, পৌষমেলাকে নিষিদ্ধকরণ, বায়তুল মোকাররমের সেই বল্গাহারা খতিবটির বঙ্গীয় সংস্কৃতির ওপর উদ্ধত মন্তব্য প্রচার (এবং সরকারের নীরব আশীষপ্রাপ্ত), সর্বোপরি মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর প্রকাশ্য জনসভার ভাষণে একাত্তরের রাজাকারদের পাশবিক ভুমিকার পুর্ণ সমর্থন - এসব যেন এক সুপরিকল্পিত কার্যক্রমেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অন্যান্য মৌলবাদী দেশের ইতিহাস থেকে এটা অনায়াসে অনুমান করা যায় যে জামাতের একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে বাংলাদেশের জন্যে। বাঘ যেমন হরিণের পালকে আক্রমণ করার আগে ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকে তারাও তেমনি অপেক্ষা করছে মোক্ষম মুহূর্তের জন্যে। এখন যা দেখতে পাচিছ তা তারই প্রারম্ভিক পাঁয়তারা। সিনেমাহলে অগ্নিসংযোগ, নাট্যমঞ্চে বোমানিক্ষেপ, বুদ্ধিজীবীদের জেলে ভরা - এ সবই যেন এক অনিবার্য ঝড়ের সঙ্কেত। এই বাঘ আরো একবার আক্রমণ করেছিল আমাদের - একাত্তরে। তখন আমাদের সুযোগ ছিল বাঘকে ঘায়েল করার। আমরা তা করিনি। এখন সে ফিরে এসেছে দলবল নিয়ে। এবার তাকে রুখতে পারব কিনা সন্দেহ। একাত্তরের সাহস বা প্রাণশক্তি কি আছে আমাদের ? মনে হয় না। একদিন হয়ত খবর পাব পয়লা বৈশাখ বন্ধ হয়ে গেছে, এমনকি শহীদ মিনার ভেঙ্গে ফেললেও আমি অবাক হব না। বর্বর জাতির কাছে ইতিহাস বা ঐতিহ্যের কী'ই বা মুল্য ? তালেবানরা যখন বুদ্ধমুর্তি ভেঙ্গে ফেলল তখন কি আমাদের জামাতী বন্ধুরা প্রতিবাদ করেছিলেন ? করেননি, কারণ ইসলামিক রাষ্ট্রে মুর্তি থাকতে নেই। বাংলাদেশেও সম্ভবত থাকবে না একদিন। আশ্চর্য হব না যদি কোনদিন দেশের আর্ট স্কুলগুলো সব বন্ধ করে দেওয়া হয়, সিনেমাহলের দরজায় তালা মারা হয়, টিভিতে ধর্মপ্রচার ছাড়া আর সব অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে যায়। নামাজরোজা হবে বাধ্যতামুলক, পর্দা হবে বাধ্যতামুলক, হয়ত তালেবান আফগানিস্তানের মত বাংলাদেশী মেয়েরা স্কুলকলেজে যাওয়ার অধিকার হারাবে। ঢাকার রাস্তায় হুজুরদের সেই স্লোগানটা আমার এখনো মনে আছে ঃ বাংলা হবে আফগান আমরা হব তালেবান। একদিন আমার আপনার ভাইবোনের মেয়েরা হয়ত সেই সৌদী মেয়েটির মত কেঁদে কেঁদে বলবে ঃ মেয়ে হয়ে জন্মালাম কেন।

প্রশ্ন হল ঃ এইরকম সমাজ গঠন করব বলেই কি দেশটা স্বাধীন হয়েছিল ? প্রশ্নটা হেসে ওড়াবার চেষ্টা করবেন না। শুধু বুদ্ধিজীবীদের কাছেই তুলছি না প্রশ্নটা, পথেঘাটের সাধারণ মানুষ, সাধারণ ধর্মপ্রাণ শান্তিপ্রিয় মানুষ, শ্রমিকমজুর, চাষী ফকির, ড্রাইভার পাচক রি□ওয়ালা ফেরিওয়ালা, সবার জন্যেই চিন্তার বিষয় এটা। আমরা মুসলমান হয়ে জন্মেছি বলেই কি আমাদের মেয়েদের পাকঘরে পড়ে থাকতে হবে সারাজীবন ? আমরা কি সত্যি সত্যি নিজেদের সব কৃষ্টি সংস্কার আচার ইতিহাস ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে লোমশ জীবের মত উপাসনাগৃহের দ্বারপ্রান্তে হাঁটু গেড়ে পড়ে থাকতে চাই ?

আমাদের পুর্বপুরুষদের কাছ থেকে ধর্মের এই ছবিটাই কি পেয়েছিলাম আমরা ? এই প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হবার সময় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে আমাদের। একটা দিন হয়ত অচিরেই চলে আসবে যখন প্রশ্ন করার অধিকারটুকুও আমরা হারিয়ে ফেলব।

ধর্ম আর রাষ্ট্র কোনদিনই ভাল মেশেনি। ধর্মীয় রাষ্ট্র হলেই যে ধর্ম শত পল্লবে পল্লবিত হয়ে ওঠে তা নয়। বরং উল্টোটা হবারই সম্ভাবনা বেশি। আজকের পৃথিবীতে ধর্মীয় স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশি কোন্ দেশে ? উত্তর আমেরিকা আর ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়াতে। সব ধর্মই সমানভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পায় সেসব দেশে। ফলে ধর্মের মানবিক দিকটাই ফুটে ওঠবার পথ পায়। ধর্ম তার স্বাভাবিক করুণারস ও সৌন্দর্যে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। ধর্মীয় রাষ্ট্রের প্রধান অস্ত্র হল কঠোর আইন, নিষেধাজ্ঞা আর আতঙ্ক। তাতে যে শুধু মানুষের চিন্তার জগতই সঙ্কুচিত হয় তা নয়, ধর্ম নিজেও শুষ্ক বালির মত অনুর্বর হয়ে পড়ে। আমার সেই প্রিয় হেডমাস্টারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমিও বলব, ধর্মের সুস্থ বিকাশ ও সম্যক প্রস্ফুটন যদি কামনা করেন তাহলে দেশকে ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াসকে এখনি প্রতিহত করুন। নইলে জাতিও মরবে ধর্মও মরবে।

অটোয়া
১৮ই জানুয়ারী, ২০০৪